জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস: প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন

শামসুজ্জামান মিলকী*

Abstract

Mahasweta Devi is a prominent novelist as well as short story writer in Bengali literature. She emerged in Bengali literature in 1956 by writing *Jhasir Rani*. She had been the voice of the merginalized people in west bengal. The Naxalbari uprising was the first major event to confort Mahasweta after she become a writer, and she has said she felt morally compelled to record its dreams and betrayals. Naxalbari, a place-name was lead a Communist political theory- Naxalism, Charu Majumdar was the architect of this. In this article we want to discuss the Naxal movement in Mahasweta Devi's selected novel.

১.১

দেশবিভাগ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাকার মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। নিম্নবর্গের জীবন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বরক্ষার নিরন্তর প্রচেষ্টা-সংগ্রামের পাশাপাশি ঔপনিবেশিকতার অবসান পরবর্তী ভারতের উল্লেখযোগ্য গণ আন্দোলনসমূহ তাঁর আখ্যানে এসেছে। জীবনের উপরিতলের নিছক কাহিনিকে নয়, বরং জীবনের গভীরতলে ডুব দিয়ে ছেনে ছেনে তুলে এনেছেন জীবনের নির্যাস, আর তা রূপায়িত করেছেন সময়-সমাজ-মানুষকে অবলম্বন করে— তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে। ব্যক্তিগত জীবনে নিরন্ন-অসহায় মানুষের জন্যে কাজ করেছেন মানবিকতার টানে। সাঁওতাল-শবর-লোধ-ওরাঁও-মুণ্ডা জাতিগোষ্ঠীর কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'বড়দিদি' হিসেবে, ওদের ভাষায় 'মারাংদাই'। সমাজ-সচেতন কথাশিল্পী বলেই তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে ভারতের কৃষক আন্দোলন, তেভাগা-নকশাল আন্দোলনসহ গণমুক্তির লড়াই— ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধিতা। সাধারণ-ব্রাত্য-আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিয়তসংগ্রামে তাঁর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়— যুক্ত ছিলেন চল্লিশেরও অধিক সভা-সমিতির সঙ্গে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনজাতিসমূহের মিলনক্ষেত্র 'আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ' তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগ-অংশগ্রহণে গঠিত হয়েছে। দলীয় রাজনীতি নয়, জীবনভর নিম্নবর্গের মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তাঁর কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক স্বর ধ্বনিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন ও এর প্রভাব রূপায়ণের শিল্পসূত্র অন্বেষণের প্রয়াস পাবো।

১.২

মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ঢাকায়, তাঁর মামাবাড়িতে— পৈতৃকবাড়ি বর্তমান পাবনা জেলার ভারেঙ্গায়, স্থায়ী বসবাস পশ্চিমবাংলায়। পারিবারিক জীবনে পিতা-পিতৃব্যের শিল্প-সাহিত্য সংশ্লিষ্টতা, সংসারজীবনে সাহিত্য ঘরানার অভ্যস্ততা, শিক্ষাজীবনে শান্তিনিকেতনে উদারনৈতিক পাঠগ্রহণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্য মহাশ্বেতাকে এক বিপুলা পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছে। পৃথিবীর পাঠশালায় জীবনশিক্ষার পাঠ গ্রহণকারী মহাশ্বেতা নিজের সৃষ্টিসম্ভার প্রসঙ্গে বলেন: 'আমার লেখালেখিকে

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

আমার কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে, নইলে [...] অনেকটাই বাকি থাকবে।'[১] তাঁর পিতা মণীষ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯) 'কল্লোল যুগে'র প্রথিতযশা সাহিত্যিক; পিতৃব্য ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) চলচ্চিত্রজগতে পরিচালক হিসেবে সুপরিচিত; প্রথম স্বামী বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৮) গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪) স্বনামখ্যাত কথাসাহিত্যিক। শিল্প-সাহিত্যের এই পরিমণ্ডল মহাশ্বেতাকে সাহিত্যিক খ্যাতি এনে দেয়নি, নিজের অবস্থান নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। কেননা সাহিত্যে তাঁর পদার্পণ যাপিত জীবনের অর্থ-সংস্থানের জন্যে। মহাশ্বেতা নিজেই জানাচ্ছেন:

> আমি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম আর্থিক চাপে পড়ে। লিখলে পয়সা পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে টিউশনি করেছি টাকার জন্যেই। লিখলে টাকা আসতো–খুব বেশি নয়, তবুও। আমার উল্টোদিকে আকাঙ্ক্ষাও খুব কম ছিল। চলে গেলেই হল, এমন আর কি। [...] আমার লেখালেখির পেছনে সাহিত্য প্রেরণা বলতে যা বুঝি তেমন কিছু ছিল না। লেখক হব সেই ইচ্ছে নিয়ে এগিয়ে আসিনি। আমি ও বিজন সেই সময় খুব লড়াই করছি। [...] একটা সময় দেখলাম–এটাই একমাত্র জিনিস যা আমি পারি।[২]

নিজের লেখালেখির সূত্রপাত বিষয়ে যিনি এমন নিরেট তথ্য নিজেই দেন তিনি তো ব্যক্তিস্বার্থ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার নিগড়ে বাধা পড়ে থাকতে পারেন না। এজন্য একসময় তিনি অনুধাবন করেছিলেন ভারতবর্ষের আদিবাসী-জনজাতিদের শুধু সাহিত্যে স্থান দিলে হবে না, তাদের জীবনের বাঁক ঘুরাতে হবে— আজীবন তিনি সেই জীবনসংগ্রামই করে গেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম গ্রন্থ *ঝাঁসির রাণী* (১৯৫৬) গল্প বা উপন্যাস না-হলেও তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথনির্মাণ করে দেয়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের লড়াই-সংগ্রাম তাঁর কথাসাহিত্যে নানাভাবে এসেছে। নকশাল আন্দোলন তাঁর লেখকসত্তায় কীভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে সৃষ্টিশীল রূপান্তরে পরিণত হয়েছে সে সম্পর্কে কথাকার অভিজিৎ সেন (জ. ১৯৪৫) এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:

> এই প্রসঙ্গে মনে রাখা অন্যায় হবে না যে, সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলন এদেশের নিম্নবর্গের মানুষকে আর কোনো সমৃদ্ধি এনে দিতে না পারলেও বেশ খানিকটা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। সেই পরিবর্তনকে অন্য লেখকদের থেকে অনেক আগেই মহাশ্বেতা দেবী সনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর গল্পে, উপন্যাসে এক নয়া বাস্তবতায় তাকে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন একেবারে অনুরকণীয় নিজস্ব ঢঙে।[৩]

এর মধ্যে নকশাল আন্দোলন ও অভিঘাত তাঁর যে উপন্যাসগুলোতে পাওয়া যায় সেগুলো হলো: *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪), *অপারেশন? বসাই টুডু* (১৯৭৮), *মাস্টার সাব* (১৯৭৯), *বিশ-একুশ* (১৯৮৩), *উনিশ নম্বর ধারার আসামী* (১৯৯৮)। এ-সকল উপন্যাসে সময় বা ইতিহাসকে তিনি দেখেছেন সম্পৃক্ত জনসমষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে, যা অবশ্যই উত্তরাধুনিক সাহিত্যচিন্তার অনুগামী। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস রচনা করেছে সে-দেশের ক্ষমতাবান শ্রেণি-গোষ্ঠী, যারা নিজেদের স্বার্থবিরোধী কিছু ইতিহাসে স্থান দিতে মোটেও আগ্রহী নয়, এমনকি এ-বিষয়ে তারা মানসিকভাবে যথেষ্ট সচেতন। উত্তর-ঔপনিবেশিক উপন্যাস রচয়িতারা হারিয়ে যাওয়া বা লুপ্ত করে দেওয়া, দমিত-নিষ্পেষিত অদৃশ্য ইতিহাসকে পুনঃনির্মাণ করেছেন। তারা নিজেদের দৃষ্টিকোণ, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা থেকে অতীতকে পুনরাবিষ্কার করতে এবং একইসঙ্গে বর্তমানকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথনবিশ্বে ঠিক এই কাজটিই করেছেন। বাংলা সাহিত্যে নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক রচিত বহু উপন্যাসের মধ্যে স্বর্ণমিত্রের *গ্রামে চলো* (১৯৭২),

অসীম রায়ের *অসংলগ্ন কাব্য* (১৯৭৩), সমরেশ বসুর *মানুষ শক্তির উৎস* (১৯৭৪), *মহাকালের রথের ঘোড়া* (১৯৭৭), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *শ্যাওলা* (১৯৭৭), তপোবিজয় ঘোষের *সামনে লড়াই* (১৯৭১), *রাত জাগার পালা* (১৯৮২), শংকর বসুর *কম্যুনিস* (১৯৭৬), জয়ন্ত জোয়ারদারের *এভাবেই এগোয়* (১৯৭৮), শৈবাল মিত্রের *অজ্ঞাতবাস* (১৯৮২), সমরেশ মজুমদারের *কালবেলা* (১৯৮২), দিব্যেন্দু পালিতের *সহযোদ্ধা* (১৯৮৪) উল্লেখযোগ্য। এ-কথা অসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায়, পশ্চিমবাংলার কথাসাহিত্যে যেসব জাতীয়-রাজনৈতিক বিষয় উপজীব্য হিসেবে এসেছে এর মধ্যে দেশবিভাগের পরেই নকশাল আন্দোলন স্থান পেয়েছে।

২.

ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ কার্যকর হলেও এই 'বিষবৃক্ষের বীজ' উপ্ত হয়েছিল তারও বহুকাল আগে। স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানাবিধ স্থানীয় ইস্যুতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে আঞ্চলিক আন্দোলন হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য এসব আন্দোলনের কোনোটির প্রভাব পুরো দেশেও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। তবে শাসকগোষ্ঠীর সাময়িক সদাচরণ বা কখনও কঠোর দমননীতির ফলে আন্দোলনকারীরা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। আবার কোনো আন্দোলন পুরো ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দেয়। এ ধরনেরই আন্দোলন হলো 'নকশালবাড়ি আন্দোলন'। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> নকশালবাড়ি শুধু একটি এলাকার নাম নয়, একটি রাজনীতির প্রতীক। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে এই নাম একটি রাজনীতির সমার্থক হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও। [...] নকশালবাড়ি সংগ্রামের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুই ধারার– অর্থাৎ, বিপ্লবী ও সংশোধনবাদী ধারার মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস।[৪]

১৯৬৭ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাংশের জেলা দার্জিলিং-এর শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি গ্রামে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তরাই-এর নকশালবাড়ি গ্রাম সন্নিহিত খড়িবাড়ি, চটেরহাট, ফাঁসিদেওয়াসহ ডেবরা, ভোজপুর, গোপীবল্লভপুর, মুশাহরি, শ্রীকাকুলাম, লখিমপুর জনপদে গড়ে তোলা হয় মুক্তাঞ্চল। এইসব গ্রাম থেকে সংগঠিত মানুষ শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে মুক্তাঞ্চলের পরিধি বিস্তৃত করার পরিকল্পনা করে। অথচ তাদের হাতে অস্ত্র বলতে তেমন কিছুই নেই যা আধুনিক সমরবাহিনির বিরুদ্ধে ক্ষণমাত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। তাহলে কেন কৃষকসমাজ সংগঠিত হয়েছিল? কেন আদিবাসী জনগোষ্ঠী, চা-শ্রমিক তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যোগ দিল? কেন নকশাল আন্দোলনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া হাজারো শিক্ষার্থী হত্যা-নির্যাতন-জেল-জুলুমের শিকার হলো? কেন শত শত মায়ের বুক খালি হলো? এই 'কেন'র সুবিধাবাদী-যুৎসই উত্তর একেক জনের কাছে একেক রকম, রাজনৈতিক আদর্শের মতপার্থক্যে উত্তর ভিন্ন ভিন্ন রকম। মহাশ্বেতা দেবী নিজেও এই 'কেন'র উত্তর দিয়েছেন, বলেছেন:

> নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা অভিহিত, তাকে বহু নমে আখ্যাত করা হয়েছে এবং সমগ্র ব্যাপারটির মুকাবিলা কিভাবে করা হয়েছে তা জানেন। ঘটনাটি অতিবাম বিচ্যুতি, কেতাবী ও অত্যুৎসাহী তরুণদের ফ্রাসট্রেশন, অন্যান্য শক্তি ও সংস্থার প্রসাদপুষ্ট ব্যাপার যাই বলা হোক না কেন, কিছু সত্য থেকে যাচ্ছে। যে যে কারণ থেকে এই আন্দোলন উদভুত, তা অক্ষুণ্ন আছে,

> অব্যাহত। [...] নিরন্ন চাষীর উপর শোষণ অব্যাহত। জোতদারগণ বেনামে দেশের প্রায় সকল কর্ষণযোগ্য জমি কয়েক হাজার পরিবারের মালিকানায় রেখেছেন, অন্য নামে চক্রবৃদ্ধি সুদের নিষ্পেষণ ও বেঠবেগারী আদায় চলেছে। [...] যে সব কারণে আন্দোলনটি ট্রিগাড হয়, কারণগুলি বিদ্যমান।[৫]

এই আন্দোলনকে, সংগঠিত পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছাতে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা হলেন দ্বিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ– চারু মজুমদার (১৯১৯-১৯৭২), কানু সান্যাল (১৯৩২-২০১০), জঙ্গল সাঁওতাল (১৯২৫-১৯৮৮) এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সিপিআই (এম-এল)। এদের বিশ্বাস ছিল 'সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আরোহন' করা। এরা চেয়েছিলেন কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না-থাকার পরও শহরের শত শত তরুণ কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার জন্য গ্রামে চলে আসে। 'শত্রুর অস্ত্রাগারই আমাদের অস্ত্রাগার হবে' এমন ভাবনায় সেনাবাহিনির বন্দুকের নলের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে দাঁড়িয়েছে। নকশালদের মতে, ভারতের জনগণের চার ধরনের শত্রু রয়েছে, এদের খতম বা ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬) নির্দেশিত পথে সমাজ-রাষ্ট্র গড়বে। এই চার শত্রু হলো: ক. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, খ. সোভিয়েত সংশোধনবাদ, গ. জমিদার শ্রেণি এবং ঘ. মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি। এদের ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে শ্রেণিবিভক্তি বিলীন করে দিয়ে সমতাভিত্তিক সমাজ গড়বে। বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী এই কৃষক সংগ্রাম একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিয়েছিল। অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়ি স্থানের নামের সমান্তরালে 'নকশাল' একটি মতবাদে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের মতো যুগান্তরকারী ঘটনা আর নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে লেখা হয়, 'তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি/নকশালবাড়ি, নকশালবাড়ি'। সেদিন যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত ও শোষিত কৃষকসমাজ দাঁড়িয়েছিল সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে, ঘোষণা করেছিল সামাজিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 'যে চাষ করে জমি তার'– শ্লোগানকে ধারণ করে জোতদারদের জমি দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে বণ্টনও করেছিলেন। এই ঘটনা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *পিপলস ডেইলির* সম্পাদকীয়তে স্থান পেলে বিপ্লবীরা আরো সংগঠিত হওয়ার প্রয়াস পায় এবং চীন বিপ্লবের ন্যায় একটি বৃহৎ পরিকল্পনার দিকে এগোয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের থেকে এই আন্দোলনে অভিমুখ যখন শহরাঞ্চলে এসে উপস্থিত হল, তখন থেকেই এর অবক্ষয়ের সূচনা। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে এই আন্দোলন নিয়ে শহরাঞ্চলে চরম বিতর্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বিভেদ-বিভাজনের জীবাণু নানাভাবে নকশাল আন্দোলনের বিপ্লব সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে। তবুও নকশালবাড়ি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এক প্রবাদপ্রতিম আন্দোলন, তাকে অস্বীকার করা যাবে না। 'মহাশ্বেতার সাহিত্য প্রতিবাদের সাহিত্য, ক্রুদ্ধ সাহিত্য। কোনো ক্ষেত্রে তা পাঠকের কাছে পক্ষপাতী বা অত্যুক্তিদুষ্ট বলেও ঠেকতে পারে। [...] প্রতিবাদী সাহিত্যের ক্রোধের সাহিত্যের বড় বিপদ বিষয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়া, কেন্দ্রীয় পাত্রকে বেশি আদর্শায়িত করে ফেলা।'[৬] মহাশ্বেতা বলেছেন, 'আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়।'[৭] মহাশ্বেতার কথাসাহিত্যে কৃষকদের দুরবস্থা, আদিবাসীদের অস্তিত্বসংগ্রাম ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব যে প্রক্রিয়ায় রূপ লাভ করেছে এই প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> সমকালে একমাত্র তিনিই ভারতীয় ঔপন্যাসিক, যার লেখায় ভাগচাষী, খেতমজুর, বেঠবেগারদের সমস্যা ও সংগ্রাম বাস্তব অর্থেই রূপায়িত, তিনিই একমাত্র কথাশিল্পী যার লেখায় ভারতীয় সমাজের অন্যতম মূল দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সামন্তবাদ ও কৃষকশ্রেণির দ্বন্দ্ব যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে।[৮]

এবার নকশাল আন্দোলন ও এর প্রচ্ছাপ অন্বেষণে মহাশ্বেতা দেবীর রচনার দিকে মনোযোগ দেয়া যাক। নকশাল আন্দোলনের সমগ্রতাকে আলোচনায় স্পর্শ করার অভিপ্রায়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণি অবস্থানের প্রতীকায়ণ হিসেবে শহুরে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের প্রেক্ষাপটে *হাজার চুরাশির মা*, কৃষক-আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণ চিত্রায়িত হওয়া *অপারেশন? বসাই টুডু* এবং আন্দোলনে নেতৃত্বস্থানীয়দের ভূমিকা রূপায়ণকেন্দ্রিক *মাস্টার সাব* উপন্যাস বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

৩.

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত সমন্বয় কমিটির ঘোষণাপত্রে কৃষি বিপ্লবকেই প্রাথমিক ও প্রধান কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়, ভারতবর্ষের বিপ্লবের বর্তমান পর্যায় হলো এক নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার প্রধান বিষয়বস্তু হলো কৃষি-বিপ্লব ও গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ। এই রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য চারু মজুমদার নির্দেশিত একমাত্র পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল– 'শ্রেণিশত্রু খতম' অর্থাৎ জোতদারদের ছোট ছোট গেরিলা স্কোয়াডের মাধ্যমে হত্যা করা ও তাদের অর্থ-সম্পদ দখল করে বিপ্লবী কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা।[৯] কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও শ্রেণিশত্রু খতমের কাজটি করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা তরুণসমাজ প্রকৃতপক্ষে শহরবাসী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সরকার ও নকশালপন্থীদের ক্রমবিরোধমূলক পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৭০-র মার্চ মাসের দিকে কলকাতা ও কয়েকটি শহরে দলের কেন্দ্রীয় কোনো নির্দেশনা ছাড়াই কথিত 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে'র ঝাণ্ডা উড়ায়। চারু মজুমদার বলেছিলেন, বিপ্লবী কর্মী, ছাত্র ও যুবকদের গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কথা। শহরের অ্যাকশন কখনোই গ্রামের সংগ্রামের বিকল্প নয়, পরিপূরক মাত্র।[১০] নকশাল আন্দোলনের কলকাতা শহরকেন্দ্রিক গেরিলা জোটগঠন, আক্রমণের পরিকল্পনাকরণ তদুপরি শ্রেণিশত্রু খতম কাজে মানসিকভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবক দলের জীবনোৎসর্গকে উপজীব্য করে মহাশ্বেতা দেবীর লেখা উপন্যাস *হাজার চুরাশির মা*। 'হাজার চুরাশি' একজন ব্যক্তির নির্দিষ্টজ্ঞাপক, সেই ব্যক্তির মায়ের আবেগ-বাস্তবতায় নির্মিত হয়েছে এই উপন্যাসের প্রতিবেদন। যেখানে কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের কনিষ্ঠ ছেলে নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে শহিদ হয়েছে– পুলিশি গণনায় তার লাশ এক হাজার চুরাশিতম। *হাজার চুরাশির মা* নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখা মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম উপন্যাস, যা রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নিজেই এক সত্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেন:

> কলকাতায় নকশাল নিধন চলছে। হেঁটেই ফিরি নিস্প্রদীপ পথ ধরে। কার্ফ্যু চলছে, ব্ল্যাকমারিয়া। দেওয়ালে লেখা শ্লোগানগুলো কথা বলে। একসময়ে দুটি ছেলে বিপরীত ফুটপাত ধরে আসত, অত রাতে কিছুদূর অবধি। আলোয়ানে মাথা ঢাকা। একদিন মুখ না ফিরিয়েই বলি তোমরা আস কেন?
>
> –আপনি একা যান।
>
> –এস না। আমার তো কিচ্ছু হবে না। [...]

> ১৯৭৩ সালে, সন্ধ্যা গড়িয়ে আমার ওই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে বলে গেল, আপনি গ্রামের আন্দোলন নিয়ে লিখছেন, শহরে আমরা প্রত্যহ মরছি। আমাদের কথা কে লিখবে? [...] 'আমাদের কথা কে লিখবে' শুনে ওদের কথাই লিখি।[১১]

ছেলে দুটির নাম তার জানা ছিল না। আখ্যানে পুলিশের খাতায় নিহতের তালিকায় এক হাজার চুরাশিতম ছেলেটির নাম ব্রতী চ্যাটার্জি– তার মায়ের নাম সুজাতা। পুত্রহারা সুজাতার স্মরণ-বিস্মরণ, স্মৃতি-ঘোর আর পরিবারের সদস্যদের আত্মকেন্দ্রিকতা ও লাম্পট্যের সমান্তরালে নির্মিত বাস্তবে আমরা দেখতে পাই ঔপন্যাসিকের শিল্পসিদ্ধ প্রতীতি। উপন্যাসের প্রকৃত সময় ব্রতীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে সংগঠিত, সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা এই চারটি সময়ানুষঙ্গে অনেকটা চেতনাপ্রবাহরীতি কৌশলে কাহিনি উপস্থাপিত। দুটি ভিন্ন প্রজন্মের, ভিন্ন জীবনদর্শনের মিশেলে মহাশ্বেতা নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাসের আখ্যানবিশ্ব। ব্রতীর পিতা দিব্যনাথ চ্যাটার্জি, সি.এ. ফার্মের মালিক। বামপন্থী ভাবাদর্শে দীক্ষিত ব্রতী তার অর্থগৃধ্নু-বিজনেসম্যান নারীলোলুপ বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল:

> দিব্যনাথ চ্যাটার্জি একক ব্যক্তি হিসেবে আমার শত্রু নন।
>
> তবে?
>
> উনি যে বস্তু ও মূল্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলোতেও অন্য বহুজন বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ যারা লালন করছে সেই শ্রেণীটাই আমার শত্রু। উনি সেই শ্রেণীরই একজন।[১২]

পিতা প্রসঙ্গে পুত্রের এই মূল্যায়ন কোনো সহজাত সম্পর্কের পরিচায়ক হতে পারে না। তাহলে ব্রতী কি বিপথগামী, পরিবার থেকে বিচ্যুত? না সে কোনোভাবেই বিচ্যুত নয়, হতেও পারে না, বরং ব্রতী পরিবারে তার মায়ের অসম্মান, পিতার ব্যভিচারী জীবনযাপন, বোনের বেহায়াপনা, বড় ভাইয়ের নির্লিপ্তি– সবকিছু মিলে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনতলার যে ঘরটিতে ব্রতী থাকত সেখানে উচ্চবিত্তের আভিজাত্যের কোনো চিহ্ন ব্রতী রাখেনি, পিতার অঢেল সম্পদ তাকে অহংকারী করে তোলেনি, বরং নকশালবাদী চেতনায় আমূল পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে চায়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজকে শ্রেণিহীন করার চিরবাসনায় দৃপ্ত সে। কিন্তু সে জানত না তাঁর পরিচয় দাঁড়াবে হাজার চুরাশি– 'মুক্তির দশকে একহাজার তিরাশি জনের মৃত্যুর পরে চুরাশি নম্বরে ওর নাম।'[১৩] মানবিকতাবোধ দিয়ে দিব্যনাথ তার ছেলের জীবনযাপনকে বিবেচনা করেনি, এমনকি মৃত্যুর পরেও সে পারেনি, বরং নকশালকর্মীর পিতার হিসেবে পরিচয়টুকু কোনোভাবেই যেন প্রকাশিত না হয় সেজন্য পত্রিকার খবর থেকে ব্রতীর নাম কাটানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। দিব্যনাথের এহেন আচরণে সন্তানহারা সুজাতা আরো বিমূঢ় হয়ে পড়ে। কাটাপুকুর মর্গে লাশ সনাক্ত করতে যেতে হয় তাকেই– সেদিন থেকে স্বামীকেও মৃতজ্ঞান করা শুরু করে সুজাতা। উচ্চশ্রেণির এই মানুষগুলো এতোই স্বার্থপর যে ব্রতীর মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকীর দিনে বাড়িতে তুলির এনগেজমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়। ব্রতীর সঙ্গে শহিদ হয়েছে সমু-লালটু-পার্থ-বিজিত, সেদিনের ঘটনার অন্তরালে ছিল এদেরই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু অনিন্দ্য, বেঁচে গেলেও জেলে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন সইতে হয়েছে আরেক বিপ্লবী নারী নন্দিনীকে। অনুরূপ ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সমরেশ মজুমদারের *কালবেলা* উপন্যাসের মাধবীলতাকে। অনিমেষের সঙ্গে তার সম্পর্কের জেরে সন্তানসম্ভবা মাধবীলতা পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কৃষক, চা-শ্রমিকদের বিপ্লবে সম্পৃক্ত করার কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে পঙ্গু হয়ে যায় অনিমেষ, তবুও পরাভব

মানেনি। এই তরুণরা সেদিন তাদের চোখে বিপ্লবের বারুদ ধারণ করেছিল, কিন্তু ব্রতীর পিতার মতো অসংখ্য দিব্যনাথরা এই বারুদ থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়েছিল। একটি সম্ভাবনাহীন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুজাতার মনে প্রশ্ন জাগে, '[...] ব্রতী মরেছিল। এই জন্যে? পৃথিবীটা এদের হাতে তুলে দেবে বলে।'[১৪] এখানেই ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর স্বাতন্ত্র্য, তিনি জানেন ইতিহাস কী বলে। কিন্তু প্রশ্ন তুলতে চান ইতিহাসের বর্ণনা সর্বৈব সঠিক কিনা এ-বিষয়ে। মহাশ্বেতাকে নিয়ে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলতে হয়:

> অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের যুগলবন্দিতে পাথেয় খোঁজেন বলে তার উদ্দীপক আলো এখনও অনির্বাণ। কী সাহিত্যকৃতিতে, কী সমাজকৃতিতে কী সৃষ্টির নন্দনে কী প্রতিবাদে প্রতিরোধে। রূপান্তরপ্রবণ সময় থেকে অবিরত দ্রাক্ষামোচন করে যাচ্ছেন তিনি; কখনও ভুলছেন না যে তার পরিশ্রম ও অন্বেষণ নিয়ত পুনর্নির্মিত হয়ে ওঠার জন্যে। মনে রাখছেন যে, সময়ের মধ্যে রয়েছে যুগপৎ প্রতীয়মান ও গভীর আকরণ অর্থাৎ আপাত-সময় থেকে প্রকৃত সময়ে উত্তরণই সৃষ্টিশীল লেখকের অন্বিষ্ট।[১৫]

৪.

'সময়টা ভালো নয়। সত্তর সাল থেকেই সময়ের কলজেয় শুধু দমকলই ঘণ্টা বাজায়।'[১৬]– *অপারেশন? বসাই টুডু* উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদে দমকলের ঘন্টা বাজানোর যে প্রতীক হাজির করা হয়েছে তাতে সমূহ বিপদের শংকা অনুভূত হচ্ছে। এই বিপদসংকেত কাদের জন্যে? কেনই-বা উচ্চমাত্রার সতর্কতা? এর যথার্থ কার্যকারণ নিহিত আছে সেই সময়ের অভিঘাতময় দিনগুলিতে। ১৯৬৭ সালের মে মাসে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন ততদিনে সারা ভারতে ছড়িয়ে গেছে– বিহার-অন্ধ্রপ্রদেশে নকশালবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। বিচ্ছিন্নভাবে পুরো ভারতই তখন নকশাল-ভাবনায় ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক দোলাচলে মগ্ন। অগ্নিগর্ভ গ্রন্থে আরো রচনার সঙ্গে *অপারেশন? বসাই টুডু* সংকলিত– এর ভূমিকায় ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী বলছেন:

> আমি বর্তমান সমাজব্যবস্থার বদলে আকাঙ্ক্ষিত, নিছক দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী, কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।[১৭]

সরাসরি রাজনীতিতে সক্রিয় না হয়েও ভারতবর্ষের মানুষের রাজনৈতিক জীবন ও পরিস্থিতিকে উপজীব্য করে সাহিত্যরচনায় মহাশ্বেতা দেবীর সমপর্যায়ে আর কোনো সাহিত্যিক আছেন বলে আমাদের জানা নেই। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন 'লেখক জীবনকালেই শেষ বিচারে উপনীত হন', সঙ্গত কারণেই লেখালেখির কারণটাও এখানে উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন, 'তাই সাধ্যমতো মানুষের কথাই লিখে গেলাম, নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না পাই সেজন্য।' সমকালের কথাসাহিত্যিক যদি এমত ঘোষণা দেন তাহলে বোঝা-ই যায় তিনি তাঁর লেখায় কাদের নিয়ে লেখেন এবং কি বিষয়ে লেখেন। লেখার ক্ষেত্রে তিনি একইসঙ্গে নিরলস ও আপসহীন। তিনি মনে করতেন, 'প্রতিটি লেখাই তো শ্রম। আর শ্রম, মানুষের শ্রমই তো কোনো কাজকে পবিত্র করে তোলে।'[১৮] আদিবাসী-জনজাতিদের নিয়ে সুপ্রচুর সন্দর্ভ রচনা করলেও মহাশ্বেতা তাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যা বা সংস্কার বিষয়ে লেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি, বরং তাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ইতিবৃত্ত আর বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বয়ান উপস্থাপন করেছেন। *অপারেশন? বসাই টুডু*

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত, নকশাল আন্দোলন যে গ্রামীণ কৃষক ও কৃষকের জীবনকেন্দ্রিক সমস্যা থেকে উদভূত সেই সত্যটি এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাস-শিরোনামের বসাই টুডু একজন আদিবাসী কৃষক নেতা, যার মৃত্যু হয় শরীরী, যে কারণে বসাই চেতনাগতভাবে পরম্পরায় বিবর্ধিত-বিকশিত ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শামিল হয়। বসাইয়ের মৃত্যু নেই–তখন এ কথা মানতেই হয়। চেতনার অগ্নিশিখার শরীরী চরিত্র বসাই টুডু ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ অবধি উপন্যাসে মারা যায় চার বার। এ-কি তাহলে একই নামে চার ব্যক্তি? না– এক ব্যক্তিরই চারবার মৃত্যু, এ কি করে সম্ভব? কেন পুলিশ প্রশাসন প্রতিবার বসাইয়ের মৃত্যুর পরও নিশ্চিত ঘোষণা দিতে পারে না? এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর একটাই– চেতনার বিনাশ নেই, বসাই টুডুর মৃত্যু নেই। তাহলে ঔপন্যাসিক এখানে কোন সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবেন তা অন্বেষণ করা দরকার। বসাই কৃষক সমিতি-ক্ষেতমজুর সমিতি করেছে। সরকার কতৃক এম.ডব্লু মিনিমাম ওয়েজ নিধারিত থাকলেও ক্ষেতমজুররা তা কখনও পায় না, উল্টো চাইতে গেলে কাজ থেকে ছাটাই, তার উপর শারীরিক অত্যাচার তো আছেই। ভারতের ভূমি ব্যবস্থার স্থায়ী সুরাহা না হওয়াতেই নকশালবাড়ি কৃষক বিপ্লবের সূচনা হয়। উপন্যাসে বসাই, কালী সাতরা– এরা কৃষক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে দেখেছে কীভাবে জোতদাররা প্রান্তিক কৃষক, ক্ষেতমজুরদের শ্রম নামমাত্র মূল্যে কিনে নেয়। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েই বসাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শ্রেণিশত্রু খতমে নামে। বসাইয়ের রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা থাকায় উপন্যাসে রাজনীতির বাতাবরণ নির্মিতি সহজাত হয়েছে, আরোপিত মনে হয়নি। উপন্যাসের বয়নে বসাইয়ের মতো চরিত্র নির্মিতিই বলে দেয় লেখকের সক্ষমতার কথা, সময়কে পুনঃনির্মাণ করে উপস্থাপনের কথা। নির্যাতিত-শোষিত মানুষের পরিস্থিতিগত প্রতিবেদন রচনায় মহাশ্বেতা কোনো মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হননি, বসাই টুডু হয়ে উঠেছে মুক্তির দশকের সক্রিয় প্রতিনিধি:

> মহাশ্বেতা দেবী কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি-লেখক নন, কোন পলিটব্যুরোর ইশতেহার অনুযায়ী গল্প ও চরিত্র রচনা করেন না। তার বসাই টুডু নকশাল আন্দোলনকেও ছাড়িয়ে যায়। শোষিত মানুষের প্রতি সংবেদী মানুষই মহাশ্বেতার উপন্যাসে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বসাই টুডু সত্তরের দশকের বাস্তবতার প্রতিনিধি।[১৯]

এই উপন্যাসের ভূগোল ঝাড়গ্রামের অরণ্য অঞ্চল– বাদ্রারি, জাগুলো, বাকুলি, কদমকুঞার বিস্তীর্ণ এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ, এরই মধ্যে গ্রামে গ্রামে আদিবাসী কৃষক-ক্ষেতমজুরদের বসবাস। বসাই টুডুকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রশাসন-শাসকদল-পুলিশবাহিনির যৌথ অভিযানে অন্য মানুষ মারা যায়, পুলিশ ভাবে সে-ই প্রকৃত বসাই। তাকে চেনে একমাত্র কালী সাতরা– তারই পুরোনো রাজনৈতিক সহকর্মী। লাশ সনাক্ত করতে গিয়ে কালী সাতরা প্রতিবারই অন্যজনের লাশকে বসাই হিসেবে সাব্যস্ত করে। ফলে বসাইয়ের পুনর্বার উত্থান ঘটে অন্য কোনো জোতদারকে হত্যার মাধ্যমে। সরকারি প্রশাসন আবার মরিয়া হয়ে ওঠে– বসাইকে জীবিত অথবা মৃত খুঁজে বের করতে। এভাবে চারবার মরে গিয়ে পঞ্চমবার প্রকৃত বসাই টুডু মারা যায়। বসাইয়ের এই মৃত্যু তাকে মহত্তম ব্যক্তি হিসেবে প্রতীকায়িত করে। ঔপন্যাসিক বসাইয়ের অবিনাশী চেতনাকে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় রূপায়িত করেছেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে চেতনাবোধ যেমন পরম্পরায় প্রবহমান তেমনি বসাই টুডু রক্তমাংসের মানুষ হয়েও চারবার মৃত্যুকে জয় করে বহুকালের ঋণ আর বেঠবেগারীর শোষণ থেকে মুক্তিলাভের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে। যে আন্দোলন নিয়ে এইরকম মহৎ আখ্যান রচিত হতে পারে সেই আন্দোলনকে ব্যর্থ বলাটা কি মূঢ়তা নয়? উপন্যাসের নিপুণ বুনন বসাইয়ের পঞ্চম মৃত্যু

পর্যন্ত পাঠককে মোহাবিষ্ট করে রাখে। বসাইয়ের বারবার জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনিতে রূপকথার একটা অন্তর্জাল ছড়িয়ে পড়লেও তা কোনোভাবেই প্রকল্পনা বা ফ্যান্টাসি হয়ে দাঁড়ায় না। কেননা উপন্যাসের পুরো প্রেক্ষাপট জুড়ে রয়েছে নকশাল আন্দোলন ও এর প্রভাবজাত সময়খণ্ড। বসাইয়ের বাতাসে গলা মোচড়ানোর মুদ্রাদোষ ছিল, সেই মুদ্রাদোষের উল্লেখে কালী সাতরা উপন্যাসে উচ্চারণ করেছে এক অমোঘ সত্য, যা চিরকালীন:

> পঞ্চম মৃত্যুতে কোন পুলিশ, কোন কালী সাতরা, কোন অন্য লোক ছিল না। অন্ধকার। [...] সে অন্ধকারে কোন সাঁওতাল বাতাসে গলা মোচড়ালে দেখতে পাবার কথা নয়, তবু কালী জানে, বসাই এবারেও অন্ধকারের গলা মোচড়ে পিষে দিয়েছিল। বাতাসকে মুচড়ে বাতাসকে অবয়ব দেবে একদিন, অন্ধাকারের গলা মুচড়ে তাকে আগুন বানাবে। যে রাতে পঞ্চম বসাইকে গোর দিয়ে ষষ্ঠ বসাই হয়ে চলে গেল, কি রকম? খুব সুন্দর হোক সে। খুব তরুণ।[২০]

বসাইয়ের পঞ্চম মৃত্যুও তাকে নিঃশেষ করে না, করতে পারে না। অন্ধকারের গলা থেকে যে আগুন জ্বলে উঠবে বলে কালী সাতরা প্রত্যাশা করছে এই আগুন চিরকালের অন্ধকারের বিরুদ্ধে জ্বলে থাকা চেতনার অগ্নিশিখা। বসাইয়ের সংগ্রাম সবকালের ক্ষমতাশালী-অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রতিস্বর। এ কারণে 'বসাই বিনাশ প্রকল্প'কে অপারেশন হিসেবে পুলিশি খাতায় লেখা হলেও মহাশ্বেতা দেবী একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দাঁড় করিয়েছেন। নকশাল আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও বসাইদের দেখানো পথ, অন্ধকারের গলা মুচড়িয়ে জ্বালানো আগুন নিপীড়িত-নির্যাতিতকে পথ দেখিয়ে যাবে অনন্তকাল। সাঁওতাল-ওরাঁও-টুডু-রাজবংশী-মাহাতো-মেদি-লেপচা-ভুটিয়া জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ইতিহাস লেখা হয় বসাই চরিত্রের আকল্পে। রাজনৈতিক অস্থির সময়ের দলিলিকরণের যে কথা মহাশ্বেতা বলেন এই দলিলিকরণই চূড়ান্ত হয় *অপারেশন? বসাই টুডুতে*। কার্যক্ষেত্রে নিয়োজিত সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনির এমত মানসিক পরিস্থিতিই বলে দেয় বসাইয়ের কর্মপরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের সফলতা বিষয়ে। বসাইয়ের প্রথম অপারেশন ছিল বানারির প্রতাপ গোলদার, তাকে হত্যা করার দু'বছর পর বসাই টুডুর পুনরুত্থান ঘটে, অথচ প্রতাপকে হত্যা করার পরই পুলিশ একজনকে হত্যা করেছিল যাকে কালী সাতরা বসাই হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। দ্বিতীয়বারে হত্যা করে কাকড়াসোলের রামেশ্বর ভূইঞাকে, তৃতীয়বারে সূর্য সাউকে হত্যা করে, চতুর্থবারে মহাজন জগত্তারণকে হত্যা করে, পঞ্চমবারে হরিধন সর্দারকে হত্যা করে এবং বসাইয়ের মৃত্যু ঘটে। বসাই প্রসঙ্গে থানার এস.আই.য়ের স্বগতোক্তি প্রণিধানযোগ্য:

> বসাই টুডু। মনে মনে আবার পাঠ রিভাইজ করতে থাকলেন এস.আই.। মরেও মরে না ব্যাটা, প্রশাসনের বৈরী। ব্যাটা অসুরের হাড়ে তৈরি। নইলে চারবার মরে, শনাক্ত হয়, প্রশাসনের খরচ পোড়ে, আবার বেঁচে ওঠে। একি সিনেমায় সম্পূর্ণ রামায়ণ? সকল অসম্ভবই সম্ভব। এ.আই. চোখ বুজলেন। রিপোর্ট মানে অক্ষর। বসাই মানে বিশ্রীরকম জীবন্ত একটা মানুষ। বসাই, তুমি মর।[২১]

সমকাল সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে সমাজ-রাষ্ট্রের অসংগতি তুলে ধরে প্রকৃতপক্ষে তিনি মানুষের কথা-ই গল্প-উপন্যাসে লিখেছেন। সেজন্য ব্রতী, বসাই টুডু, জগু মাহাতোরা তাঁর চেনা গণমানুষের আকল্পে নির্মিত। 'সাহিত্যসৃষ্টি ও গণমানুষের উত্তরণ– এ দ্বিবিধে দ্বিতীয়টিকে আজীবন অগ্রাধিকার দিয়েছেন।'[২২] এই বসাই চরিত্রকে আবার পাওয়া যায় লেখকের 'এম.ডব্লিও বনিম লখিন্দ' গল্পে, সেখানেও বসাই সংগ্রামী, অধিকার আদায়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, গণমানুষের জাগরণের প্রত্যাশায় আকাঙ্ক্ষিত, পেটুয়া পুলিশ বাহিনির অত্যাচারে জর্জরিত। বসাই টুডু– হার না-মানা এক জ্বলন্ত প্রতিবাদী নাম।

৫.

মুক্তির দশকে বিহার জেলার কৃষক-শ্রমিক জাগরণ আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকা জগদীশ মাহাতো পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেন। সরকারপন্থীদের ধারণা ছিল বিহারের নকশাল আন্দোলন নেতৃত্বের সংকটে পড়ে বিপর্যস্ত হবে। জগদীশ মাহাতো পেশায় ছিলেন শিক্ষক– নিম্নবর্গভুক্ত পরিবারে জন্ম নেয়া জগদীশের আকাঙ্ক্ষা ছিল পড়ালেখা শেখার। কিন্তু উচ্চবর্গের অনুমতি না থাকায় বালক জগুর পড়ালেখার সুযোগ ছিল না। বালকের একান্ত আগ্রহ দেখে গ্রামপ্রধান জগুকে স্কুলে পড়ার অনুমতি দেয়। স্কুলে গিয়ে জগদীশ শেখে 'ভারতবর্ষের সব মানুষ সমান'। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আর বইয়ের পড়ার মধ্যে এমন ফারাক থাকতে পারে তা জগদীশ কখনও ভাবতেই পারেনি। এই জগদীশ মাস্টার চরিত্রের উপন্যাসীয় বিনির্মাণ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর *মাস্টার সাব* উপন্যাসে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মূল আলোচনায় নির্বাচিত তিনটি উপন্যাসের বিশেষত্ব নিয়ে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জগদীশ মাস্টার আন্দোলনের সংগঠক– সক্রিয় নকশাল নেতা, উপন্যাসে সমাজচিন্তক। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সক্রিয় নকশালকর্মী ব্রতী, কৃষক-ক্ষেতমজুর সংশ্লিষ্ট আদিবাসী বসাই টুডু আর জগদীশ মাস্টার মিলে নকশাল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত শ্রেণি-বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, মহাশ্বেতার এই তিনটি উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র-বীজ তিনি বাস্তব-জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া প্রত্যেকটি উপন্যাসেই দিন-তারিখের সরাসরি উল্লেখ এ-কথাই প্রতিষ্ঠা পায় যে, মহাশ্বেতা দেবী আখ্যান রচনায় 'রাজনৈতিক সময়ের আকল্প'কে প্রাধান্য দেন। নিজেই বলেন, 'প্রতিবাদের জন্য চিৎকৃত প্রতিবাদে আমার আস্থা নেই।' প্রতিবাদকে তিনি বক্তব্যে পরিণত করেন বলেই উপন্যাসে 'রাজনৈতিক সময় তাকেই বলি যখন সময়ের সাধারণ অভিজ্ঞতা পাল্টে যায়, যখন মন্ত্রের মতো উজ্জীবনের গান রক্ত থেকে উঠে আসে। চিরলাঞ্ছিত ব্রাত্যজনেরা বুঝে নেয়, বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভালো।'[২৩] জগদীশ মাস্টার সবাইকে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে শিখিয়েছিলেন। তার শুরুটা গ্রামে, যখন সে বিদ্যার্জন করে মাস্টার হলো তখন। মাস্টার অনুভব করে বইয়ে লেখা জ্ঞান আর বাস্তবের জ্ঞানের যোজন-যোজন দুরত্ব। শ্রেণিগত পার্থক্য আর উচ্চবর্গের নির্যাতনের শিকার হয় নিম্নবর্গ। সকলের সমান অধিকার যদি থেকেই থাকে তাহলে অধস্তনের প্রতি এতো অবজ্ঞা-অবহেলা কেন? কেন উপন্যাসের রামেশ্বর আহীর ডাকাত হতে বাধ্য হয়? কেন লছমন সিং ভক্তরামের স্ত্রীকে জোরপূর্বক শ্লীলতাহানি করে? এইসব 'কেন'র উত্তর প্রসঙ্গেই জগদীশ মাস্টার সমাজ-ভাবুক। উপন্যাসের কথক-চরিত্র একজন মা– যে তার ছেলের কাছে তার দেখা সময়ের বিবরণ দিচ্ছেন, উপন্যাসের নায়ক চরিত্র হয়ে ওঠা মাস্টার সাবের পরিস্থিতি ও পরিণতি শোনাচ্ছে। লেখক আমাদের চেনাচ্ছেন মাস্টার সাবকে:

> কোনো কমিউনিস্ট পাটির সদস্য ছিল না মাস্টার সাব। কোনোদিন ভাবেনি নিরন্ন খেতমজুরকে বলবে, চলো। উঠাও বন্দুক। তুমি বন্দুক উঠালে মালিকও ডরে চলে যাবে।[২৪]

কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে, অপরের শেখানো কোনো তত্ত্বের আশ্রয়ে মাস্টার সাব বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেনি। মাস্টার সাব নিজে থেকেই উপলব্ধি করে 'সবাই রুখে দাঁড়ালে বন্ধ হবেই অত্যাচার।'[২৫] ১৯৬৭-র নির্বাচনে প্রথম সুযোগ তৈরি হয় অত্যাচারিতের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার। মাস্টার সাবের কথা-বক্তৃতায় মালিকশ্রেণির দালাল সমর্থক প্রার্থীকে হারিয়ে জিতে যায় রামনরেশ। তবে রামনরেশের মনোভাব পাল্টে গিয়ে সেও সুবিধাবাদী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী হয়ে ওঠে। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে মাস্টার সাব শহরে গিয়ে হরিজনদের সংগঠিত করতে চায়, কিন্তু সেখানে সে

পুরোপুরি সফল হয় না। হতাশ মাস্টার সাব তখন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মী রঘু মহাজনের কাছে জানতে পারে 'নকশাল আন্দোলন' দানা বেঁধে উঠছে। নিপীড়িতের মুক্তির লক্ষ্যে সত্যকামী জগদীশ মাস্টার যেন সঠিক পথের দিশা পায়। মাস্টার সাব অনুধাবন করতে পারে 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।' নকশাল আন্দোলনে শ্রেণিশত্রু খতমের জন্য বন্দুকের নলকেই শক্তিশালী বিবেচনা করা হয়েছিল। শহরের দেয়ালে দেয়ালে এই শ্লোগানও লেখা হয়েছিল। এই কাজে তার সঙ্গে যুক্ত হয় রামেশ্বর আহীর, যে কি-না উচ্চবিত্তের মিথ্যা ষড়যন্ত্রের জালে ডাকাত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জেলে ছিল। এবার শুরু হয় মাস্টার সাবের 'কাজ'– ভোজপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের মধ্যে আত্মচেতনার জাগরণ ঘটাতে থাকে। ১৯৭০ সালে ফেব্রুয়ারিতে পুরোনো ভোজপুরের কুদরার জনসভায় যখন চারু মজুমদার বক্তৃতা করে তখন মাস্টার সাব পূর্ব ভোজপুরে। মাস্টার সাবের স্বগতোক্তিতেই রয়েছে সমকালের পরিস্থিতি:

> আমি অনেক ভেবেছি, পিপরপাঁতির যদু কোয়ারি মাঝারি গোছের জমির মালিক। অথবা মাহিয়ার রাম চামার ধনী লোক। তারাও জুলুম ওঠায় হরিজনের উপরে। আবার বরাম্ভোন যেখানে গরিব কিষান, সেও মার খায় মালিকের হাতে। জাতবর্ণের কারণে জুলুম হ্যায় হ্যায় ভাইয়া, কিন্তু আসল কারণ অন্যত্র।[২৬]

এবার শুরু হয় পূর্ণ লড়াই– নিম্নবর্গের নারীকে লাঞ্ছিত করতে আসা শিউপূজন হেনস্তা হয়, লছমন সিংয়ের খড়ের গাদা আগুনে ভস্মীভূত হয়। জগদীশ মাস্টার বুঝতে পারে শুধু নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদ নয়, এবারের সংগ্রাম সবক্ষেত্রে নিচু জাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। জমি ও ফসলের ন্যায্য পাওনা আদায়ের লড়াই। যে সম-অধিকারের কথা বইয়ে লেখা থাকে তা অর্জনের লড়াই। 'কেননা মালিকদের অত্যাচার ও শোষণ মূলত সমাজশ্রেণির ওপর, এবং নিম্নবর্গের ওপরেও।[২৭] মাস্টার সাব রামেশ্বর-মুক্তারামদের অস্ত্র সরবরাহ করে, গোপন আস্তানা থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ভোজপুরে মাস্টারের নেতৃত্বে শ্রেণিশত্রু খতমের কাজ চলে– লছমন সিং, শিউপূজন, অধবনারায়ণ, মলখান, নন্দু ভকত, বাবুসাব নিশ্চিহ্ন হয়। মাস্টার সাব অবৈধ সমাজপতিদের কাছে ত্রাসে পরিণত হয়। কিন্তু এমন সমাজবিপ্লবী নকশাল নেতাকেও প্রাণ দিতে হয় ভুল বোঝাবুঝিতে, প্রাণ হারায় রামেশ্বর আহীর। ভোজপুরের নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে, যেমনটা হয়েছিল চারু মজুমদারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নকশাল আন্দোলনের কর্মপরিকল্পনার। এভাবেই মায়ের কথনে মাস্টার সাবের নকশাল নেতা হয়ে ওঠা এই প্রতিবেদনে ধরা পড়ে– 'একদিনে আগুন জ্বলেনি ভোজপুরে, একদিনে মাস্টার সাব বনেনি কহানী।'[২৮] একটি আন্দোলন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছালে আমরা এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখি, এর দীর্ঘ প্রেক্ষাপট অজানাই থাকে। সেই অজানাকে নকশাল আন্দোলনের পূর্ব-প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখিয়ে মহাশ্বেতা রচনা করেন এই অনন্য রাজনৈতিক সন্দর্ভ, 'মাস্টার সাবের কহানী কেমন করে শেষ হয়? সে যে নিজেকে রোপাই করে রেখে গেছে ভোজপুরের গরীব-ভুখা মানুষের রক্তে রক্তে।'[২৯] প্রাণহারানো মাস্টার সাব যুক্ত হন মুক্তির মিছিলে।

'একটা জাতি যত ক্ষুদ্রই হোক, সে যদি হিম্মতের সঙ্গে নিজের ভাগ্য গড়ার সংগ্রামে নামে, অনেক অঘটনই ঘটিয়ে দিতে পারে।'[৩০] মহাশ্বেতা দেবীর নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাসের চরিত্ররা সাধারণ মানুষের ভাগ্য গড়তে সত্যিই হিম্মতের পরিচয় দিয়েছিল। তাঁর *ঘরে ফেরা*, *বিশ-একুশ*, *উনত্রিশ নম্বর ধারার আসামী*, *গান্ধারী পর্ব* উপন্যাসসমূহে নকশাল আন্দোলন নানা মাত্রায় রূপায়িত হয়েছে, প্রতীকায়িত হয়েছে বিভিন্ন পরিস্থিতি। *ঘরে ফেরার* প্রধান চরিত্র একজন লেখক, যে

সত্তরের দশকের অগ্নিগর্ভ সময়ে প্রেমের উপাখ্যান রচনা করেছেন। সমকাল তাকে স্পর্শ করেনি, যেন মুক্তির দশকের বার্তা তার কানে পৌঁছায়নি। যে কারণে নকশাল আন্দোলন ও এর প্রভাবকে সাহিত্যে রূপদান এড়িয়ে যায়। মহাশ্বেতা এই লেখক চরিত্র দেবাদিদেবের মাধ্যমে সমকালবিমুখ সাহিত্যিকদের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেছেন। *বিশ-একুশ* উপন্যাসের পরিসরে লেখক সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনকে তুলে ধরেন। সমাজের নিম্নবর্গের পক্ষাবলম্বন করে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়া তপু চরিত্রের সাযুজ্য পাওয়া যায় হাজার চুরাশিতম লাশ হয়ে পরিচিত হওয়া উপন্যাসের চরিত্র ব্রতীর সঙ্গে। নকশাল আন্দোলনের পূববর্তী ও পরবর্তী সময়ের দ্বিবাচনিক আবহে *বিশ-একুশ* উপন্যাসটি অনন্য মাত্রায় উপনীত হয়েছে। *গান্ধারী পর্ব* উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী *মহাভারতে*র গান্ধারীর মতো এক মায়ের অবচেতন মনের মাধ্যমে রক্তাক্ত সময়কে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের চরিত্র নীলিমার দুই সন্তান হারানোর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চক্রান্তে শূন্যগর্ভ সমাজের মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

৬.

নকশাল আন্দোলন নিয়ে একক কথাশিল্পী হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীই সবচেয়ে বেশি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। এ-কারণে নকশাল আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস তাঁর উপন্যাসমালায় গ্রথিত হয়ে আছে। সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনকারীরা ধারালো অস্ত্র-বন্দুক হাতে নিয়েছিলেন, তাদের কথা লিখতে গিয়ে মহাশ্বেতা যে কলম তুলে নিয়েছেন তা আরো সুতীক্ষ্ম। স্বীকার করতেই হবে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাঁর নির্মোহ ও নিরপেক্ষতার কথা। তবে আন্দোলনকারীদের বিষয়ে তাঁর মনোভাব কখনও কখনও একরৈখিক মনে হওয়ারও সুযোগ রয়ে গেছে, যা সীমা অতিক্রান্ত নয়। সাম্প্রতিক ইতিহাস নিয়ে প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে তিনি সত্য ও তথ্য বিষয়ে ছিলেন একনিষ্ঠ। এজন্য আখ্যানের বিশেষ উপস্থাপনায় মহাশ্বেতার উপন্যাস হয়ে ওঠে বিশ্বাস্য। রাজনৈতিক প্রতিবেদনের 'বিশ্বাস্যতা ছাড়া ইতিহাসের সত্য, মানুষের সত্য, শিল্পের সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।' নকশাল আন্দোলন নিয়ে সাহিত্য রচনায় মহাশ্বেতা দেবী অনতিক্রান্তই থেকে যাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মহাশ্বেতা দেবী, *অন্যলেখা* (কলকাতা: আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ১৯

২. কল্যাণ মৈত্র, মহাশ্বেতা, এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', *আমার সময়*, সম্পাদক: বব রায় (কলকাতা: ২০০৯), পৃ. ১৮

৩. অভিজিৎ সেন, 'মহাশ্বেতা দেবী: অগ্রগণ্য কথাকার', *কোরক*, সম্পাদক: তাপস ভৌমিক (কলকাতা: ২০০৩), পৃ. ২৭

৪. অমর ভট্টাচার্য, *নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন* (কলকাতা: নয়া ইশতেহার প্রকাশনী, তৃ-প্র, ২০০২), পৃ. ৪০

৫. মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৭), ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

৬. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০০), পৃ. ৩১৫-৩১৭

৭. মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পূর্বোক্ত

৮. নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ১৪১

৯. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *জোয়ার-ভাটায়: ষাট-সত্তর* (কলকাতা: পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ৭৩

১০. আজিজুল হক, *নকশালবাড়ি: ত্রিশ বছর আগে ও পরে* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২), পৃ. ৫৬

১১. 'মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার', *দৈনিক আজকাল* (কলকাতা: ১১ জানুয়ারি ১৯৯৮), রবিবাসর

১২. মহাশ্বেতা দেবী, *হাজার চুরাশির মা* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ১৮

১৩. তদেব, পৃ. ১৩

১৪. তদেব, পৃ. ১২০

১৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'মহাশ্বেতার আখ্যানবিশ্ব: ইতিহাসের মনন', *উপন্যাসের ভিন্নপাঠ* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২), পৃ. ৯৩

১৬. মহাশ্বেতা দেবী, *অপারেশন? বসাই টুডু*, *অগ্নিগর্ভ* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৭), পৃ. ১

১৭. মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পূর্বোক্ত

১৮. দেবেশ রায়, 'তাঁর কীর্তি প্রতি মুহূর্তের নির্মাণ', তবুও *একলব্য*, সম্পাদক: দীপঙ্কর মল্লিক (কলকাতা: দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, ২০১৮), পৃ. ১০

১৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫), পৃ. ২৮০

২০. মহাশ্বেতা দেবী, *অপারেশন? বসাই টুডু*, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ. ১৬২

২১. তদেব, পৃ. ১২

২২. হোসনে আরা, *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৮), পৃ. ৩৮

২৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের সময়* (কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৬

২৪. মহাশ্বেতা দেবী, *মাস্টার সাব*, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র-১১* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩), পৃ. ১২

২৫. *তদেব*, পৃ. ২৮

২৬. *তদেব*, পৃ. ৮৯

২৭. *তদেব*, পৃ. ২২

২৮. *তদেব*, পৃ. ৮

২৯. *তদেব*, পৃ. ৭৬

৩০. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯